Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 119 - 131
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক কল্প-গল্পে বিজ্ঞান চেতনা

প্রীতম চক্রবর্তী
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : laxmipritam90@gmail.com
ও
অধ্যাপক সুনিমা ঘোষ
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sunimaghosh70@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Science Fiction, Science Consciousness, Imaginary Zoology, Miracle, Seer & Visionary, Literary Pleasure.

Abstract
Today's busy life has made human society increasingly selfish. Even at a time when many species are about to disappear from the world, is it the right time to remain calm? We have been so focused on the complexities of profit and loss that we have given priority to things like ecosystems only as texts, without showing any interest in them in real life. However, we have seen its consequences in the devastation caused by viruses like the Noble Corona. Now the question is, even we have become aware? Many living things around us are being born and dying everyday due to the pollution caused by us which we don't even notice. But some liberal people are still alive in the world who are not only thinking about their own interests but also fighting for the existence of these smaller creatures in their own way. Some took to the streets and chose the path of rebellion, while others took up the pen. The purpose is same, to point the finger at the ineffectual demonic masks to show that humanity has not yet disappear. Premendra Mitra is such a philanthropic personality. In his writings, the word of kindness has been carefully analyzed for the creatures and animals. But in a novel way, in a science fiction twist; As a result, it has become the center of attraction for everyone. We may not be able to say from which psychology the author has invented these stories but the motive behind it is to love the biosphere and science fiction. And the love of science fiction has encouraged us to consume these stories. As a result of which, we have chosen as our topic "Premendro Mitrer Prani-Bidya Bishoyok Kolpo-Golpe Bigyan Chetona". The main article focuses on Premendra Mitra's zoological science fiction stories briefly. We witness a wonderful fusion of science fiction and zoology in every story. Also the message of awareness. I presented a small part in summary.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

কল্পবিজ্ঞান এমন এক ধরণের সাহিত্য যেখানে 'কল্পবিজ্ঞান নিছক কল্পনাও নয় আবার বিজ্ঞানও নয়।'[১] যে কল্পনার দ্বারা সব সাহিত্য গড়ে ওঠে সেই কল্পনাই, কল্পবিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সাহিত্য অনেক সময়ই বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে থাকে। বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা, বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বা ইতিহাসের কোন বিস্মৃত অধ্যায় এইসব বিষয় বৈচিত্র্যের উপর কথা সাহিত্যের নামকরণ ও শ্রেণি পাল্টে যায়। এগুলি হয় যথাক্রমে রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, চরিত্রমূলক বা ঐতিহাসিক উপন্যাস। কল্পবিজ্ঞানেও সেরকম বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয় বিজ্ঞানকে। বিজ্ঞানের তথ্য শুধু নয়, সত্যটুকু সাহিত্যিক কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন এবং এই কাজে কল্পনা তাকে বিপুলভাবে সাহায্য করে থাকে। সুতরাং, একথা বোধহয় ভুল হবে না যে কল্পনা ও বিজ্ঞানের সম্পর্কেই সূত্রপাত কল্পবিজ্ঞানের।

অন্যান্য শাখার মত কল্পবিজ্ঞানেরও একটি সাহিত্যমূল্য আছে। যেমন— ঐতিহাসিক গল্প উপন্যাসে ইতিহাসের সত্যতা অনেকটাই মেলে, আর সামাজিক উপন্যাসে মেলে সমাজ বাস্তবতার পরিচয়। তেমনি কল্পবিজ্ঞানে মেলে বৈজ্ঞানিক সত্য বা ভবিষ্যতের বিজ্ঞান কেমন হবে তার একটা পরিচয়। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব বা বিজ্ঞান-উপকরণকে সাহিত্য পদবাচ্য হতে গেলে যে মূল্যমানে এবং যে সংবেদনে অলঙ্কৃত হতে হয় তার গুরুত্ব কম নয়। সাহিত্য পাঠেই মেলে আনন্দ। কল্পবিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়। আট থেকে আশি সব বয়সের মানুষই এর থেকে আনন্দ লাভ করতে পারে। তবে কল্পবিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ আনন্দ তখনই পাওয়া যায় যখন পাঠকের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলী ও তার ব্যাখ্যা এবং সূত্র সম্বন্ধে পূর্ব থেকে ন্যূনতম জ্ঞান বর্তমান থাকে।

সাহিত্যের নতুন শাখা কল্পবিজ্ঞানে যা লেখা হয় অনেক সময় তা বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ প্রদান করে ভবিষ্যতের নিত্য নতুন আবিষ্কারে, যা অন্য কোন সাহিত্যের শাখা পারে না। যেমন- জুল ভার্ণের 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দি সি' (১৮৭৩) উপন্যাসটিতে বর্ণিত সাবমেরিন এর কল্পনা পরবর্তীকালে বাস্তবে রূপ পেয়েছিল, আবার তাঁরই লেখা 'ফ্রম আর্থ টু দি মুন' (১৮৭৩) ভবিষ্যৎ এর চন্দ্রাভিযানের সূচনা করেছিল। সর্বোপরি বলতে হয় কোনো গোয়েন্দা কাহিনি যেমন একবার পড়তে শুরু করলে পাঠক সেই গোয়েন্দার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে রহস্যের উন্মোচন কিভাবে হবে তা চিন্তা করে রোমাঞ্চিত হন। ঠিক একইরকম ভাবে কল্পবিজ্ঞানের পাঠক অন্য কোন গ্রহে অভিযানে গিয়ে বা কোনো বৈজ্ঞানিক ঘটনাগত কারণের রহস্যের সমাধানে যুক্ত হয়ে, সাহিত্যরসের আস্বাদন আকণ্ঠ পান করে থাকেন। কাজেই কল্পবিজ্ঞানকে সৃষ্টিমূলক সাহিত্য হিসেবে মানতে আমাদের দ্বিধা বোধ হয় না।

বিজ্ঞান শোনায় বাস্তব জগতের কাহিনি কিন্তু কল্পবিজ্ঞানে থাকে কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধন। বস্তুত, বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ, সাহিত্যসুলভ কল্পনার সঙ্গে বিজ্ঞানের সূত্রগুলির সংযোগের দরুণ গড়ে ওঠে কল্পবিজ্ঞান। তাই কল্পবিজ্ঞান মূলক যে কোন সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞানের ছোঁয়া থাকে। প্রকৃত কল্পনাপ্রবণ মন বিজ্ঞানের সেই ভিত্তির মধ্যেই খুঁজে নেয় তার কল্পনার জগৎকে। আর এইজন্যই পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী ফ্রেড হোয়েল লেখেন 'দ্য ফিফথ্ প্ল্যানেট'- এর মত উপন্যাস আবার কল্পবিজ্ঞান লেখক আর্থার সি. ক্লার্ক গবেষণা করেন সমুদ্রের জলস্তরের তাপমাত্রা ভেদের উপর নির্ভর করে কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও কল্পনার এখানে মেলবন্ধন ঘটেছে। সত্যিকারের কল্পবিজ্ঞান কেমন হওয়া উচিত প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই এক জায়গায় সে কথা বলেছেন—

> "যথার্থ বিজ্ঞান নির্ভর গল্প শুধু অসার অলীক কল্পনা যে নয়, বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তা যে অনাগতের আশ্চর্য পূর্বাভাস দেয়, তার বহু প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে।"[২]

কল্পবিজ্ঞান কাহিনিতে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা থাকবে। থাকবে অজানা সম্ভাব্য জগতের কথা, অদ্ভুত প্রাণিদের কথা, আর আগামী দিনের নতুন উদ্ভাবনের কথা। তবে এতদ্‌সত্ত্বেও কল্পবিজ্ঞানের বহুমুখী বিচিত্র জগৎকে সংজ্ঞার বাঁধনে বাঁধা সম্ভব নয়। কিন্তু কল্পবিজ্ঞানে যা তুলে ধরা হয় তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের তত্ত্বের সহায়তায় করা যায়। ফলে তৈরী হয় বিকল্প বাস্তবের যুক্তি, যা বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করে। অতএব বোঝায় যাচ্ছে বিজ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের অস্তিত্ব শূন্য। তবে এ সম্পর্কে জনৈক কিছু সমালোচকেরা তাদের মূল্যবান চিন্তাগুলিকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন প্রকৃত বিজ্ঞান সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত এবং কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপনে কীভাবে এটি প্রভাবিত করেছে। সঙ্কর্ষন রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও বেশি বিজ্ঞান-সচেতন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিটি রচনা, কবিতা ও গানের মধ্যে তাঁর বিজ্ঞান চেতনা ও ভাবনা প্রতিফলিত। তাঁর মতে বিজ্ঞান সচেতন না হলে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, সাহিত্য রচনা বিজ্ঞানভিত্তিক হলেই সার্থক হয়। তিনি মনে করতেন যে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার সাহিত্যে কোন স্থান নেই।"[৩]

তিনি আরো বলেছেন যে—

> "আমার মতে বাংলার বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও উপন্যাসকে সার্থক করে তুলতে হলে মৌলিক দেশীয় উপকরণের ভিত্তিতে লেখা উচিত। বৈজ্ঞানিক উপকরণ তো চারদিকেই ছড়িয়ে আছে, তাদের কুড়িয়ে নিয়ে মৌলিক বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প বা উপন্যাস রচনা বাংলার গল্প বা উপন্যাস লিখিয়েদের পক্ষে কঠিন নয়।"[৪]

লীলা মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "যা কিছুকে চেতনা, উপলব্ধি, বুদ্ধি আর কল্পনা দিয়ে আয়ত্ত করা যায়, জ্ঞান বলতে সে-সমস্তকেই বুঝতে হবে। কাজেই তার ক্ষেত্রও অপার এবং অপরিসীম। তারই মধ্যে কোনো বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলন করাকে আমরা সাধারণ মানুষরা বিজ্ঞান বলে ভাবি। আরো মনে করি বিজ্ঞান আর সাহিত্য দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। বাস্তব নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার, অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে সাহিত্যের, কিন্তু এই আলাদা করার চেষ্টাটাকে কিঞ্চিৎ হাস্যকর বলে মনে হয়।
>
> মাটির ওপরে ডালপালা বিস্তার করে, সবুজ পাতা মেলে যে সুন্দর ফুলটি ফোটে, তার সুগন্ধে বাতাস আমোদিত হয় ওদিকে মাটির নিচে রংহীন শিকড়টি কঠিন পাথর ভেদ করে গাছের জন্য রস আহরণ করে, তবে না গাছের শিরায় শিরায় সেই রস প্রবাহিত হয়ে, ফুল ফোটায়, রং ধরায়, সৌরভ ছোটায়। সাহিত্যকর্ম হল ঐ পাতার ঘেরা ফুলটির মতো, যার বিকশিত হওয়া সম্ভব হত না, যদি না লোকচক্ষুর অন্তরালে বিজ্ঞানীর সত্যসন্ধানী দৃষ্টি কাজ করত।"[৫]

তিনি আরো বলেছেন যে—

> "বিজ্ঞান আর সাহিত্য নিজের নিজের ক্ষেত্রে এতকাল নির্বিঘ্নে চলে আসছিল। কল্পনা বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষকের আদৌ চলে না। তবে পরখ না করে তারা কল্পনার প্রশ্রয় দেন না। প্রতিটি নতুন আবিষ্কারের পিছনে, বিজ্ঞানীর দুঃসাহসিক কল্পনা কাজ করে।"[৬]

মানুষ আছে বলেই অন্বেষণ আর অন্বেষণের ফলই হল বিজ্ঞান সাহিত্য, সমালোচক রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ভাবনাকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে।

> "রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হল। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই, আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম ভাঙার মত।' -শুরু আর শেষ নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই। যত কিছু ঝামেলা মাঝের টুকু নিয়ে। নইলে যে গল্প প্রাচ্যের মহাজ্ঞানী রাজাকে শুনিয়েছিল- মানুষের ইতিহাস, সে তো এক লাইনের গল্প 'মানুষ এল, বাঁচল এবং মারা গেল'। মানুষ বাঁচলো বলেই তার অন্বেষণ। তার সমন্বয়ের ধারণা। গণিতের মত সব কিছুকে একাঙ্গী করে, একত্রিত করার সাধনা। বিজ্ঞান সাহিত্য সেই সাধনার ফল। এখানে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিজ্ঞানের প্রমাণের উপরি পাওনা হল সাহিত্যিক আনন্দ-মনের অনুভূতি ছাড়া তার অন্য প্রমাণ তো সম্ভব নয়।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।"[৭]

তারকমোহন দাস বিজ্ঞান সাহিত্যের স্পষ্টতা প্রসঙ্গে বলেছেন -

"বিজ্ঞান সাহিত্যকে স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধ করতে গেলে যে বিষয়গুলোর উপর নজর দেওয়া প্রয়োজন সেটি হল-
প্রথমত : মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিক গবেষণা লব্ধ ও জ্ঞানের সংযোগ থাকা দরকার।
দ্বিতীয়ত : লেখনী যথেষ্ট সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া চাই। একটি লাইন পড়বার পর পাঠকের ইচ্ছা হবে পরের লাইনটি পড়বার, যে ইচ্ছা পাঠকের পক্ষে চেপে রাখা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোন জ্ঞান নেই যা দুর্বোধ্য ও নীরস। যে লেখা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বা নীরস বলে মনে হয় সেটা মূলত লেখকের ত্রুটির জন্যই ঘটে থাকে। বিজ্ঞানের প্রবন্ধ নীরস হবে কেন? বিজ্ঞানের মধ্যে যা বিস্ময় আছে তা মানুষের অতিবড় কল্পনা শক্তিকে হার মানাবার ক্ষমতা রাখে, তা ছাড়া সত্যের প্রতি মানুষের একটা সহজাত আকর্ষণ তো আছেই। বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞানের থেকে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক যদি তা ঠিক মত পরিবেশিত হয়।
তৃতীয়ত : বিজ্ঞানকে সাধারণের উপযোগী করে পরিবেশন করার মধ্যে একটা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে, - এই তাৎপর্য হল একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রয়াস। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় যাঁরা আজ নিমগ্ন- বিজ্ঞানকে সহজ করে, আকর্ষণীয় করে পাঠকের কাছে তুলে ধরা ছাড়াও একটি লক্ষ্য তাদের সামনে রয়েছে, তা হল পাঠকের মনে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা। আমরা অধিকাংশই বিজ্ঞানের তথ্য আহরণ করি, কিন্তু চিন্তায়, মেজাজে ও কাজে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হই। একজন সাধারণ শিক্ষিত নাগরিক, - নাইবা থাকল তার বিজ্ঞানের কোন ডিগ্রী, তবু চিন্তা ও জীবনে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে অসুবিধা কি? তিনি যদি অনুসন্ধিৎসু হন, অন্ধবিশ্বাসী না হন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তবে তাঁর অনুসন্ধান প্রবৃত্তির সঙ্গে সৃজনী শক্তির সংযোগ ঘটলে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে তিনি সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারবেন। নূতন পথের সন্ধান দিতে পারবেন। এই ধরনের পাঠক তৈরি এবং তার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করাও বিজ্ঞান লেখকদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে থাকা উচিত।"[৮]

সিদ্ধার্থ ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"আমার ব্যক্তিগত অনুভব অনুসারে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।
এক - বিজ্ঞান জগতের খবরাখবর মূলক বিজ্ঞান সাংবাদিকতা।
দুই - চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষাদায়ী রচনা।
তিন - বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক রচনা অর্থাৎ মানব সমাজের অগ্রগতির প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা।
চার - বিজ্ঞান-আশ্রিত কুসংস্কারবিরোধী রচনা
পাঁচ - বিজ্ঞান জগতের আধুনিকতম গবেষণা সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা, (মানব-কল্যাণ বিরোধী বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা সম্বন্ধে সতর্ক করার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে)।

> ছয় - সাধারণ মানুষের কল্পনা ও কৌতুহলকে জাগ্রত করা।
> সাত - স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান-পাঠের পরিপূরক রচনা যা বিজ্ঞানকে নিরস যান্ত্রিক মুখস্ত করা কিছু শব্দ ও তথ্যের বাইরে এনে বিজ্ঞানকে জীবনের অঙ্গ, একটি জীবন দর্শন রূপে সজীব করে তুলবে।
> আট - বিজ্ঞানকে সামাজিক যাবতীয় সমস্যা থেকে স্বতন্ত্র, সর্বক্লেশ ও সমস্যার আধুনিক এক দেবতা রূপে উপস্থাপিত করার বিরোধিতামূলক রচনা।"[৯]

জয়ন্ত বসু এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "বিজ্ঞানের সেই শাখাকে আমরা যথার্থ বিজ্ঞানসাহিত্য বলতে পারি, যার প্রধান উপজীব্য বিজ্ঞানের এক বা একাধিক বিষয়। সেই সাহিত্য নানান রূপে প্রকাশ পেতে পারে- প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, এমনকি কবিতা বা ছড়ার রূপে তা থাকতে পারে কিন্তু তার সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে বিজ্ঞানের উপর। আমরা মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের অলৌকিক কাহিনীর কথা শুনে থাকি। এ যেন সোনার পাথরবাটি। বিজ্ঞানের মধ্যে কোন অলৌকিকত্ব বা ম্যাজিক থাকতে পারে না। কোন ঘটনাকে অত্যাশ্চর্য মনে হলেও তার মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রকৃতির নিয়মই কাজ করছে এবং কোন না কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিজ্ঞানের কাজ হল সেই নিয়মকে খুঁজে বের করা, সেই কার্য-কারণ সম্বন্ধকে উদ্ঘাটন করা। বিজ্ঞান সাহিত্যের একটি প্রধান কাজ হল মানুষের জিজ্ঞাসু মনকে জাগিয়ে তোলা।"[১০]

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে বিজ্ঞানসাহিত্যে কি কল্পনার স্থান নেই? নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেই কল্পনা এমন হতে হবে যে, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে, পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সঙ্গে তার যেন কোন বিরোধ না থাকে। শুধু তাই নয়, আর্থার ক্লার্ক রচিত কয়েকটি কল্পকাহিনির কল্পনার মতন তা এমন হয় বাঞ্ছনীয় যে, ভবিষ্যতে তার বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।

বিজ্ঞান সাহিত্যকে সার্থক হতে হলে অবশ্যই উদ্দেশ্যমুখী হতে হবে। সেগুলি হল—

১. বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব ও তথ্যগুলিকে যথাসম্ভব সহজ ও সরস করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের ভয়-ভীতি কেটে যায়, বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। যারা নিরক্ষর, তারাও শুনে শুনে কালক্রমে বিষয়গুলি জেনে যাবেন।

২. বিজ্ঞানের যেসব প্রয়োগ জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর, সেগুলি তাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৩. বিজ্ঞানের নানান অপব্যবহার এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অশুভ দিকগুলি সম্বন্ধে সকলকে সচেতন ও সতর্ক করতে হবে।

৪. জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটাতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে মানুষ সমস্ত বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করে নেয়। পুরনো ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস যদি ভেঙে যায়, তাহলেও সে বাস্তব সত্যকে এবং নবলব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করে না, বরং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে তার জীবনদর্শন নতুন করে গড়ে তোলে। প্রতিটি ঘটনাকে সে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গী মনের জড়তা কাটিয়ে দেয়, কাটিয়ে দেয় ভাগ্যের উপর নির্ভরতার মানসিকতা।

৫. বিজ্ঞানের যে অজস্র সম্ভার, তা যাতে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সত্যিকারের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়, সেজন্য উপযুক্ত মানসিকতা তৈরি করতে হবে। বিজ্ঞান সাহিত্যের এখনো পর্যন্ত এ দিকটি অত্যন্ত অবহেলিত। মনে রাখতে হবে, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবিকতার সংশ্লেষণ একটি অত্যন্ত জরুরী কাজ।[১১]

প্রকৃত বিজ্ঞান সাহিত্য কেমন হবে এ প্রসঙ্গে অমিত চক্রবর্তী বলেছেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে না হলেও, বাঙালী সাহিত্যিকদের অনেকে অবশ্য এখন কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখতে রীতিমতো আগ্রহী— যদিও আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো না থাকার দরুণ ওদের গল্প- উপন্যাসগুলি সাধারণতঃ ফ্যান্টাসীয় পর্যায়ে রয়ে যায়। সায়েন্স ফিকশনের নামে পত্র-পত্রিকায় এখন যেসব উদ্ভুতুড়ে কম্পকাহিনী লেখা হয় তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা জাগাতে কতটা সক্ষম তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এই প্রসঙ্গে, সাম্প্রতিক একটা বাংলা গল্পের কথা মনে পড়ছে যেখানে ভিনগ্রহ থেকে আগন্তুকরা এসে পৃথিবীর খাল-বিল-নদীর জল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। বিজ্ঞানকে ম্যাজিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এ জাতীয় প্রচেষ্টার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।
>
> এইসব কম্পবিজ্ঞান পড়েই বোধ হয় বেশ কিছু মানুষ এখন সাইন্স ফিসনের নামেই খড়গহস্ত। অথচ সায়েন্স- ফিকসন বিজ্ঞান-সাহিত্যেরই অঙ্গ এবং কম্যুনিকেশনের ক্ষেত্রে ভারি ভারি তথ্য-তত্ত্ব ভরা প্রবন্ধ যা পারে না, একটা সার্থক সায়েন্স ফিকসন তো অনায়াসেই পৌঁছে দেয় পাঠকের মনের মণিকোঠায়।"[১২]

অতএব উপরোক্ত সমালোচনাগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কল্পবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান চেতনায় সমৃদ্ধ হতে গেলে বিজ্ঞান সাহিত্যের যে গুণগুলি থাকা দরকার তা হল- কলগল্পটিকে হতে হবে মৌলিক ও দেশীয় উপকরণে সমৃদ্ধ, গাছপালার শেকরের সাথে জলের যে সম্পর্ক সেইরূপে গল্পে সম্পর্ক স্থাপন হবে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের, দুঃসাহসিক কল্পনার থাকবে অবতারণা, বিষয়বস্তুর একাঙ্গীকরণ ও আনন্দানুভূতি প্রদান, গল্পে থাকবে অলৌকিকত্ব বা ম্যাজিক যা সৃষ্টি করবে জিজ্ঞাসু মনের এবং বর্ণিত উদ্ভাবনগুলির ভবিষ্যতে বাস্তব হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকবে। এবারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পগল্পে এই বিজ্ঞান চেতনার ভিত্তি কিভাবে রক্ষিত হয়েছে তা অন্বেষণ করবো। তবে তার পূর্বে খুব সংক্ষেপে লেখকের জীবনাবলী এক লহমায় দেখে নিবো—

খ্যাতনামা লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৪ সালে তাঁর পিতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন মিত্র। সাউথ সুবারবন স্কুলে পড়তে যেতেন সাহিত্যিক, পরবর্তীকালে সেখান থেকেই মাধ্যমিক। তৎকালীন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন ভালো ফলসহ। কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখেই কর্মজীবনে ঝাপিয়ে পড়েন। কখনো প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা, কখনও টালিখোলার ব্যবসা। আবার কোনো সময় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট। পরে সুভাষচন্দ্রের 'বাংলার কথা' ও 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন। বেঙ্গল ইমিউনিটির কর্মী থেকে ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার সচিব, ছায়াছবির চিত্রনাট্য রচনা করা থেকে পরিচালনা ইত্যাদি বিচিত্র রকমের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন নানান সময়ে।

১৯২৪ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'শুধু কেরানী' নামে গল্পটির মাধ্যমে সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে, প্রথম গল্প লিখেছিলেন তেরো বছর বয়সে 'কাদম্বিনীর ছেলে'। ধীরে ধীরে বিভিন্ন গল্পগ্রন্থের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণির শিল্পীতে পরিণত হন।

কল্পবিজ্ঞানের লেখক হিসেবেও আমরা তাঁর অনন্যতার পরিচয় লাভ করে থাকি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পিঁপড়ে পুরাণ' প্রকাশিত হয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'রামধনু' পত্রিকায়। এরপর তিনি সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখকে পরিণত হন। 'কুহকের দেশে', 'ময়দানবের দ্বীপ', 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' (পরে 'শুক্রে যারা গিয়েছিল' নামে প্রকাশিত), 'আকাশের আতঙ্ক', 'শমনের রং সাদা' প্রভৃতি কাহিনির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানভিত্তিক মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির পথ খুলে দেন। তাঁর জীবনের একটি ব্রত ছিল- বিজ্ঞানচেতনা সৃষ্টি করা। ঘনাদাকেন্দ্রিক গল্পগুলিতে আমরা তাঁর সেই ব্রতপালন লক্ষ্য করে থাকি। প্রেমেন্দ্র মিত্র সারা জীবনে বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্যও কিছু কম লেখেননি। প্রায় দেড়শো গ্রন্থের লেখক, চিত্রনাট্যও রচনা করেন প্রায় সত্তরটি। এর মধ্যে চোদ্দটির মত চলচিত্রের পরিচালনা করেন। ছোটদের জন্য 'রংমশাল' এবং 'পক্ষীরাজ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর সাহিত্য কর্মের পুরস্কার পান প্রচুর। ১৯৫৭ সালে আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৫৮ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৭৩-এ আনন্দ পুরস্কার, ১৯৭৪ সালে সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯৭৯-এ শরৎ পুরস্কার এবং এই সালেই পদ্মশ্রী, ১৯৮৮ তে দেশিকোত্তম তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করে। হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটের বাড়িতেই ১৯৮৮ সালেরে ৩মে তারিখে পাকস্থলীর ক্যানসার জনিত কারণে তিনি পরলোক গমন করেন। দেব সাহিত্য কুটিরের ১৩৫২ বঙ্গাব্দের পূজাবার্ষিকী 'আলপনা' থেকে আমরা পেলাম ঘনশ্যাম দাস, সংক্ষেপে ঘনাদা চরিত্রটি। বয়স- "পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোনও বয়সই তাঁর হতে পারে।"[১৩] কারণ তাঁর চেহারা ছিল শুকনো হাড় বের করা, যা দেখে বয়স আন্দাজ করা একেবারে অসম্ভব। তাঁর বাসস্থান বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেনের একটি মেস। 'মশা' গল্পটির মাধ্যমেই ঘনাদার গল্পমালা শুরু হয়। ঘনাদার গল্পগুলি ছাড়া তিনি বিভিন্ন স্বাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ও কল্পবিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস লিখেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্যকর্ম গুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। সেগুলি হল—

১. ভিন গ্রহের প্রাণি বিষয়ক কল্প-গল্প।
২. প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক কল্প-গল্প।
৩. উদ্ভাবন বিষয়ক কল্প-গল্প।
৪. অভিযান বিষয়ক কল্প-গল্প।
৫. বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্প-গল্প।

আলোচনার নিরিখে আমরা শুধুমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক কল্প-গল্পগুলিতে বিজ্ঞান চেতনার দিকটি কিভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করবো ও সেই সাথে আগামী দিনে এই সমস্ত কাল্পনিক বিষয়গুলির সম্ভাব্যতা শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে তা বিজ্ঞানের অপার রহস্য সম্বন্ধে পড়ুয়াদের মনে উৎসুক্য জাগাতে পারলে আমার প্রবন্ধটিকে সার্থক বলে মনে করবো।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক কল্প-গল্পগুলি যথাক্রমে —

১. মশা :

ঘনাদা তাঁর অভিযান চালান জাপানের উত্তরে সাখালীন দ্বীপে ১৯৩৯ সালের ৫ই আগষ্ট। সেখানে তিনি যান অ্যাম্বার নামক দামি রত্ন সংগ্রহ করবার একটি কোম্পানির হয়ে অ্যাম্বার সংগ্রহ করতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁদের কোম্পানির তানলিন নামে এক চিনা মজুর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়। তাকে খুঁজতে ডাক্তার মি. মার্টিন এবং ঘনাদা বেরিয়ে পড়েন। এভাবেই তাঁরা এসে উপস্থিত হন জাপানি কীটতত্ত্ববিদ মি. নিশিমারার গবেষণাগারে। সেখানে থেকে তাঁরা জানতে পারেন যে, নিশিমারা মশার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটান যে—

"সাপের বিষের চেয়েও সে লালা মারাত্মক হয়ে উঠেছে।"[১৪]

আর তার ফলেই নিশিমারা তানলিন সহ একের পর এক ব্যক্তিকে তাঁর পরীক্ষাগারে গিনিপিগের মতন মারেন। গল্পের শেষে নিশিমারার কাফ্রি সঙ্গীও এই মশার কামড়ে মারা যান, আর নিশিমারা ও তার উদ্ভাবিত মশা ঘনাদার এক চাপড়ে এক সঙ্গেই মারা যায়। তৎসহ ঘনাদার উক্তি —

"জীবনে তারপর মশা মারতে আর প্রবৃত্তি হয়নি"[১৫]

গল্পটিকে অন্যমাত্রা দান করে। 'মশা' গল্পটির ঘটনাস্থল সাখালীন দ্বীপ। যখন প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পটি লিখেছিলেন তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিজয়ীপক্ষ আর বিজিতপক্ষের মধ্যে সন্ধির ব্যবস্থাগুলোর সময় সামনে এসে পড়ে সাখালীনের ভাগ্য নির্ণয়ের প্রশ্ন।

সুতরাং এই গল্পেও বাস্তব ঘটনার উপর কল্পনার মিনার তৈরী করা হয়েছে। তবুও মশার লালার রাসায়নিক এই মশক অভিযানের মাধ্যমে আমরা বাংলা সাহিত্যের অনন্য সাধারণ চরিত্র ঘনাদার আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করি।

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় গল্পটি হল —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২. পোকা :

একটা নারকুলো পোকা দেখে ঘনাদার ভয় পাওয়া এবং সেই ভয়কে চাপা দেবার জন্য ঘনাদার গল্প বলা শুরু হয়। ১৯৩১ সালের ঘটনা, ঘনাদার পূর্ব পরিচিত জেনারেল ভরনফ জানান ৭৬ বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান যে তাঁর ভাই ড. রথস্টাইন এবং তিনি দুজনেই ইহুদী। কিন্তু ঘটনাচক্রে জার্মানির নাৎসিদের উপর প্রতিশোধ নিতে দুজনে দু-রকম পথ ধরেন। প্রুশিয়ান সেজে জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ভরনফ এবং রথস্টাইন যিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন তিনি তাঁর মিথ্যা মৃত্যুর খবর প্রচার করে এক অদ্ভুত পোকা উদ্ভাবন করেন যা গোটা ইউরোপকে শ্মশানে পরিণত করে দিতে পারে। কিন্তু সেই পোকার ঝাঁক মারা পড়ল কিছু অঘটন ঘটাবার আগেই কারণ —

> "...ভরনফ যে বন্ধ শিশিটি দিয়েছিলেন তার দরুন। তার ভেতর এমন একটি রোগের জীবাণু ছিল যা সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়ার যম।"[১৬]

ঘনাদা একটি পতঙ্গের শরীরে সেই রোগের বিষ ঢুকিয়ে দেন। তারপর সেই রোগ সংক্রামক হয়ে —

> "সমস্ত পতঙ্গবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়।"[১৭]

গল্পটির মধ্যে পঙ্গপালের মারণ শক্তির ব্যবহার অতিচমকপ্রদ। বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের দিক থেকে 'মশা' ও 'পোকা'র মধ্যে মিল রয়েছে— দুটি গল্পই নির্মিত হয়েছে জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, প্রথমটিতে মশার শরীরে এবং পরেরটিতে সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া তথা পঙ্গপালের শরীরে এমন রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে যা জীববিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের গবেষণার বিষয়। পার্থক্য শুধু এই যে ওই গবেষকগণের উদ্দেশ্য মানবের হিতসাধন আর গল্প দুটির বৈজ্ঞানিক দু-জনের লক্ষ্য মানবের অনিষ্ট সাধন। কিন্তু অনিষ্টের চক্রান্তকে বানচাল করতে না পারলে ঘনাদার মান মর্যাদা কীসের? এই পর্যায়ের পরবর্তী গল্পটি হল—

৩. মাছ :

গল্পের শুরু হয় কেন ঘনাদা মাগুর মাছ খান না তার বর্ণনা দিতে গিয়ে। তিনি বলেন যে, জার্মানির এক নামজাদা সার্কাস কোম্পানি আর স্পেনের এক চিড়িয়াখানার বায়না নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে নানান জাতের অদ্ভুত দুষ্প্রাপ্য প্রাণী তখন তিনি ধরে বেড়াচ্ছেন। এইভাবে গোরিলার সন্ধান করতে গিয়ে ড. হিলের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ঘনাদা। এই ভূগোল বিলাসী ড. হিলকে গল্প বলবার সময়ের পাঁচ বছর আগে এক অ্যালিগেটর কুমিরের কবল থেকে নাকি বাঁচান ঘনাদা। তবে এবার ড. হিল আফ্রিকার জংলিদের এক সর্দারকে মাথা ধরার অ্যাসপিরিন বড়ি দিয়ে একদম চাঙ্গা করে তোলেন। তারপর ঘটনাচক্রে জংলিদের পুরুতদের শিকার হন ড. হিল এবং তাকে বাঁচাতে গিয়ে ঘনাদা। এরপর মাগুর মাছের ছটফটানি দেখে ভূমিকম্প হবে বুঝতে পারেন ঘনাদা আর সেই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তি পান। গল্পের শেষে শিবু যখন প্রশ্ন করে কি মাছ ছিল সেটা। ঘনাদা গম্ভীরভাবে বলেন- "ওদেশের একরকম মাগুর মাছ, 'ইংরেজিতে বলে Cat fish"[১৮] গল্প হিসেবে অভিনব এবং জীববিদ্যার অজানা, অচেনা প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

এই পর্যায়ের চতুর্থ গল্পটি হল—

৪. কাঁটা :

ঘনাদাকে কাঁটাওয়ালা বাটা মাছ খেতে দেওয়ায় তিনি একটু অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর কাঁটা ছাড়া বেলে মাছ তাকে খেতে দেওয়ায় তিনি অপমানিত বোধ করেন এবং মেসের থেকে প্রেমেন্দ্র চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তখন উল্টো দাওয়াই হিসেবে মেসের সবাই মেস ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিতেই ঘনাদা এক নতুন গল্পের অবতারণা করেন। তিনি প্যাসিফিক কম্যান্ডে কেব্লগ্রাম করে জানাতে চান যে প্রশান্ত মহাসাগরকে আবার তিনি বাঁচিয়ে তুলবেন। রহস্যের উন্মোচন করতে গিয়ে ঘনাদা বলেন—

> "গিলবার্ট মার্শাল মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে তখন ক্যারোলাইনে গিয়েছি সেখানকার ম্যালাও পলিনেশিয়ান ভাষার আদি রূপ খুঁজে বার করতে।"[১৯]

এরপর ইফালিক নামে এক সমুদ্রিক অ্যাটল অর্থাৎ সমুদ্রের মাঝখানে প্রবালে গড়া এক-একটা গোলাকার স্থলের বালা আর তার মধ্যে থাকা সায়র। সেখানে গিয়ে পামার আর তার তিন সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে ঘনাদার। এখানেই ঘনাদা সন্ধান

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পান এই সমস্ত প্রবাল দ্বীপগুলিকে ধ্বংসকারী অ্যাকহ্যাস্টার প্লানচি-র, যার আরেক নাম হল কাঁটার মুকুট। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত প্রবাল দ্বীপের তলায় গিজগিজ করছে এই কাঁটার মুকুট। এদের খাদ্যবস্তু হল প্রবাল।

> "এ কাঁটার মুকুটের খিদে এমন রাক্ষুসে যে এদের একটি ঝাঁক একমাসে আধমাইল প্রবাল প্রাচীর খেয়ে ফেলতে পারে আর ফেলছেও তাই।"[২০]

এই কাঁটার মুকুট হল আসলে রাক্ষুসে তারামাছ আর এদের একমাত্র যম হল শিঙে-শাঁখ ট্রাইটন। গল্পের শেষে জানা যায় এই ট্রাইটন শিকার করে বেড়ায় পামার এবং তার সঙ্গীরা এরপর ঘনাদা প্যাসিফিক কমান্ডের হাতে তুলে দেন এই শিকারীদের। তৎসহ দেন প্রশান্ত মহাসাগরকে গরল মুক্ত রাখার উপায় ট্রাইটন। ঘনাদার কথায়—

> "...নিজেদের লোভে আর আহাম্মুকিতে এই ট্রাইটন শিকার করে মানুষ তার নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। মানুষের সেই রকম শত্রু চারজনকে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি, আর সেই সঙ্গে দিচ্ছি প্রশান্ত মহাসাগরকে আবার সুস্থ করে তোলার দাওয়াই এই ট্রাইটন।"[২১]

প্রকৃতি প্রেমের গল্প হিসেবেও এটি অন্যতম দাবী রাখে। সামুদ্রিক বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে ভিত্তি করে এক নিটোল গল্প এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

এই পর্যায়ের পরবর্তী গল্পটি হল-

৫. হিমালয়ের চূড়ায় :

গল্পকথক বলেছেন হিমালয় অভিযান অনেক হলেও একবার একশো কুলি ও ইউরোপের বাছা বাছা বাইশজন পাহাড়ে ওঠার ওস্তাদ বীরের ভেতর মাত্র একজন প্রাণ নিয়ে ফিরেছিলেন। তিনি হলেন অভিযানের নেতা মি. লজ। ঘটনাচক্রে এই মি. লজ আত্মগোপন করবার কুড়ি বছর পরে গল্পকথকের সঙ্গে দেখা হয় এবং তিনি তাঁর আত্মগোপন করবার কারণ বলতে গিয়ে বলেন যে, তারা যখন ছাব্বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন হিমালয় অভিযানে গিয়ে তখন তাঁদের দলের এক সদস্য মি. বেন হঠাৎ উধাও হয়ে যান। এরপর মি. বেনের অর্ধভুক্ত, রক্তাক্ত দেহের সন্ধান মেলে। এর রহস্যভেদের পর দেখা যায় এক অদৃশ্য উত্তর মেরুর ভাল্লুকের মত দেখতে জানোয়ারের হাতে মি. বেন প্রাণ দিয়েছেন। মি. লজের ডায়রি থেকে জানা যায়-

> "জানোয়ারটি যেন আগাগোড়া স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে তৈরি।"[২২]

মি. লজ এরপর বেঁচে ফিরলেও তাঁর আর সঙ্গীসাথীদের কোনো খোঁজ না করতে পারার জন্য তাঁর গভীর অনুশোচনা হয় এবং তার জন্যই আত্মগোপন করে আছেন। তাঁর মতে —

> "এ জানোয়ারের অস্তিত্ব না জেনে ও তার বিরুদ্ধে প্রস্তুত না হয়ে হিমালয়ের শিখরে আরোহণের চেষ্টা গোঁয়ার্তুমি; সে চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য।"[২৩]

ইয়েতি জাতীয়, প্রাণীর উল্লেখ যদিও আমরা বারবার পেয়েছি, তার দর্শন সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। একে ভিত্তি করে এই জাতীয় অদৃশ্য প্রাণীর কল্পনা অভিনবত্বের দাবী রাখে। কাহিনির মধ্যে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর থেকে অভিযানের রোমাঞ্চের যোগসূত্রতা প্রাধান্য পেয়েছে।

এই পর্যায়ের পরবর্তী গল্পটি হল—

৬. করাল কীট :

পরীক্ষাগারে অধিকাংশ জিনিসসহ পেনাঙের সরকারি কীটতত্ত্ববিদ ড. সূর্যকান্ত সরকার হঠাৎই রহস্যজনকভাব অন্তর্ধান করেন। গল্পকথক বলেছেন তিনি যখন শিকারি হিসেবে একটু নাম করেছেন তখন এক আমেরিকার ফিল্ম কোম্পানির হয়ে এক দ্বীপে যান যেখানে হারিয়ে যাওয়া, কীটতত্ত্ববিদ সূর্যকান্তের ডায়েরির সঙ্গে সঙ্গে অতিকায় ভয়ঙ্কর মাকড়সাদের ও অতিকায় শুয়োপোকাদের সম্মুখীন হন তারা। সূর্যকান্তের ডায়ারি থেকে জানা যায় কীটপতঙ্গের অসাধারণ শক্তি লক্ষ করে তাদের আকৃতিকে বৃহৎ করবার কোনও গোপন উপায় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওই বৃহদাকার হিংস্র মাকড়সার হাতেই তাঁর প্রাণ যায়।

দুঃস্বপ্নের দ্বীপের থেকে ফেরবার পর দ্বিতীয়বার গল্পকথক, মি. লঙ, ও বৈজ্ঞানিক ড. পামার আবার সেই দ্বীপে অভিযান করেন। এবার তাঁরা দ্বীপে আরও বড় মাকড়সার সন্ধান পেলেও সেগুলিকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পান। কারণ হিসেবে ড. পামার বলেন-

> "ওদের দেহের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে ওদের প্রাণশক্তি পাল্লা রাখতে না পারায় ওরা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে ধীরে ধীরে সব মারা পড়েছে।"[২৪]

তবে ড. পামার আশা জানিয়ে বলেছেন–

> "ড. সরকারের সাধনা নিষ্ফল হবে না। এই থেকে মানুষ একদিন কিছু না কিছু উপকার পাবেই।"[২৫]

এই গল্পের প্লট গঠনে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদের সঙ্গে কল্পবিজ্ঞানের আমেজও পাওয়া যায়। কীটপতঙ্গের অসাধারণ ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নির্ভর করে রচিত এই গল্পটি অভিনবত্বের দাবী রাখে।

এই পর্যায়ের পরবর্তী গল্পটি হল—

৭. মামাবাবুর নিদ্রাভঙ্গ :

গল্পের মূলচরিত্র মামাবাবুর ঘরে চোর ঢুকতে দেখেন তাঁর প্রতিবেশী মি. ভোরা। কিন্তু চোরকেও পাওয় যায় না এবং সে কিছু চুরিও করে না। এরপর মামাবাবু তাঁর ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে অসমে তাঁর বন্ধু মিঃ চালিহার কমলালেবুর বাগানে বেড়াতে যান। মি. ভোরার কমলালেবুর বাগানও তার কাছে অবস্থিত ছিল, মামাবাবুও সেখানে গিয়ে উপস্থিত এবং সঙ্গে মি. ভোরার জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে যান লেডি-বার্ড নামে এক ধরণের পোকা, যার বৈজ্ঞানিক নাম এপিল্যাকনা বেরিয়ালিস।

এরপর ঘটনা পরম্পরায় জানা যায় মি. ভোরাই আশেপাশের সমস্ত বাগানে কিনে নেবার জন্য এই লেডি বার্ড নামক কমলালেবুর সর্বনাশকারী পোকা ছড়িয়েছেন, তাই প্রতিশোধ নেবার জন্য মামাবাবু জামাই মি. ভোরের বাড়ি থেকে এই পোকা চুরি করে এনে রহস্যসৃষ্টি করে তাঁর ঘরে ঢোকেন। তাঁর ভাগ্নে যখন এরপর প্রশ্ন করে সামনের দরজা দিয়ে এসে ঢুকলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কল্পবিজ্ঞান না কেন তখন মামাবাবু বলেন–

> "ঢুকলে রঘুবীর জানতে পারত। সে ভোরার চর। আমি চালিহার বাগানের ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছি জেনে ভোরা আমার পাহারা রাখতে চেয়েছিল।"[২৬]

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প হিসেবে গল্পটি নতুনত্বের দাবী রাখে।

এই পর্যায়ের পরবর্তী গল্পটি হল—

৮. পিঁপড়ে পুরাণ :

লেখক কল্পনায় এক ভবিষ্যৎ জগতের ছবি এঁকেছেন, যেখানে সামান্য পিঁপড়ে মানুষের উপর তার অধিকার কায়েম করেছে। ৭৮৯৯ সালের পরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কীভাবে পিঁপড়ের সারা পৃথিবীর মানব জাতির উপর আক্রমণ করে তার ধারাবাহিক বিবরণ কখনো পর্যটক অশেষ রায়, আবার কখনো লেখক সেনর সাবাটিনি বা দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ অতিকায় পিঁপড়ের আক্রমণ থেকে পালিয়ে আসার পর পাঁচ বছর যিনি পিঁপড়েদের সঙ্গে তাদের দেশে কাটিয়েছেন, সেই সুখময় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। পিঁপড়েদের অস্ত্রশস্ত্র, তাদের ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে এঁদের কাছ থেকেই তথ্য পাওয়া যায়। গল্পের শেষে আমরা দেখি সুখময় সরকার পিঁপড়েদের কাছ থেকে পালিয়ে আসেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি বলেছেন-

> "মানুষ আবার দক্ষিণ আমেরিকা অধিকার করবার আয়োজন করছে- কিন্তু আমার সে আয়োজনের প্রতি আর আস্থা নেই।"[২৭]

কারণ-

> "পিঁপড়েদের আমি যেরকম করে জানবার সুযোগ পেয়েছি, তাতে এরকম বিশ্বাস আমার সহজেই জন্মেছে।"[২৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পিঁপড়েদের মানুষের জায়গায় যোগ্যতর হিসেবে আত্মপ্রকাশ অভূতপূর্ব সৃষ্টির দাবী রাখে, তাদের শৃঙ্খলাবোধ আর কর্মনিষ্ঠার যেসব তথ্য আমরা কীট তত্ত্ববিদদের কাছ থেকে পেয়ে থাকি তার ওপর ভিত্তি করেই এ গল্প লেখা।

> "ডাফনি দ্য মরিয়ারের গল্প অবলম্বন করে তোলা হিচককের অবিস্মরণীয় ছবি 'বার্ডস'- এর কথা মনে পড়ে যায় এ গল্প পড়লে।"[২৯]

এছাড়াও পিঁপড়েদের ভাষা মানুষের কানে না পৌঁছানোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ঘোড়ার বদলে মেঠো ইঁদুরকে বহন কার্যে লাগানোর কথা, তাদের মানুষের চোখ অন্ধকারে দেবার মত অস্ত্রের কথা নতুনত্বের দাবী রাখে। আবার বুকে করে বোমা এনে নৌকো, জাহাজ গুঁড়ো করে দেবার পদ্ধতি যেন আধুনিক আত্মঘাতী জঙ্গি বাহিনীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়, লেখকের ভাষায়-

> "প্রত্যেক বোমার সঙ্গে একটি করে পিঁপড়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রাণ দেয়।"[৩০]

এই পর্যায়ের পরবর্তী গল্পটি হল—

৯. অবিশ্বাস্য :

গল্পকথক বলেছেন তিনি এই গল্পের কাহিনি সত্যেনবাবুর কাছ থেকে পেয়েছেন। সত্যেনবাবু যখন জঙ্গলে কাঠুরেদের সঙ্গে থাকতেন তখন কাঠুরেদের মধ্যে একরকম জ্বরের প্রাদুর্ভাবের ফলে সুদূর ব্যংকক থেকে এক ডাক্তারবাবুকে আনা হয়। সেই ডাক্তারবাবু একদিন ঘটনাচক্রে এক টিকটিকিরই ডান পায়ের থাবার তিনটে আঙুল কেটে ফেলেন। তারপর হঠাৎ কোন এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী জানোয়ারের আক্রমণে তাঁদের ছাগলের খোঁয়াড়ের সব ছাগল মারা যায়। পরবর্তী আক্রমণে পঁচাত্তর জন কাঠুরেকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এই জানোয়ার। গল্পের অন্তিম পর্বে পৌঁছে দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের টিরানোসোরাসটি আসলে ডাক্তারবাবুর হাতে আহত হওয়া সেই টিকটিকিই।

> "ছুরিটা লেগে কোনোরকমে টিকটিকিটার ঘাড়ের গ্ল্যাণ্ড কীভাবে কেটে যায়।"[৩১]

তারপর সেটা বড়ো হতে হতে ক্রমশ ডাইনোসোরাসের অকার নেয় এবং সবাইকে আক্রমণ করে, শেষে ডাক্তারবাবুর গুলিতেই প্রাণ দেয়।

গল্পটির পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে কল্পনার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে তাই-

> "...গল্পের বীভৎস প্রাণীটি যতই অবিশ্বাস্য হোক, শরীরের ওপর গ্ল্যান্ডের প্রভাবের বৈজ্ঞানিক সত্যকেই এখানে কাজে লাগানো হয়েছে।"[৩২]

গল্পের বর্ণনার চমৎকারিত্ব নজর কেড়ে নেয়। অতি সাধারণ পরিচিত একটি প্রাণীর এই জাতীয় বিবর্তনের পরিকল্পনা লেখকের মৌলিকতাকে প্রমাণ করে।

এই পর্যায়ের পরবর্তী গল্পটি হল-

১০. আকাশের আতঙ্ক :

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার চিরঞ্জীব গ্রেপ্তার হন তাঁর একজন ভৃত্য হত্যার দায়ে। এরপর একের পর এক বিমান দুর্ঘটনা তৎসহ সাধারণ লোকও আক্রান্ত হতে থাকেন। এইসব রহস্যের মূল কারণ জানবার জন্য বন্ধু অশোক রায়ের সঙ্গে তার বিমানে চড়ে গল্পকথক অভিযানে যান। শেষে তাঁরা আবিষ্কার করেন সমস্ত ঘটনার পিছনে স্যার চিরঞ্জীবের নিউগিনি থেকে আনা টেরোড্যাক্টিলের ডিম থেকে বের হওয়া এই প্রাচীন প্রাণীগুলিই দায়ী, স্যার চিরঞ্জীবের-

> "চাকরটিকে অমন নৃশংসভাবে তারাই হত্যা করেছিল।"[৩৩]

ফলে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল স্যার চিরঞ্জীবের এই মতবাদটি, প্রাচীন যুগেরে সরীসৃপ বংশলোপ পায়নি।

ঘটনার বর্ণনাক্রমে অ্যাডভেঞ্চার ও রোমাঞ্চের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। তবে "সত্যজিৎ রায়ের একটি গল্পের কথা মনে পড়বেই এ গল্প পড়লে।"[৩৪] গল্পটির ঘটনার প্রেক্ষাপট ও রচনাকাল ভিন্ন হলেও সত্যজিৎ-এর 'টেরোড্যাকটিলের ডিম' গল্পটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়।

এই পর্যায়ের অন্তিম গল্পটি হল –

১১. মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী :

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে উগি নামে একটি দ্বীপ মি. বাফেট কিনে নিয়ে নারকেলের কারবার শুরু করেন। সেখানেই একদিন এক অদ্ভুত প্রাণীর অস্তিত্ব তিনি খুঁজে পান। যারা মানুষের মত দেখতে হলেও সমুদ্রের নীচে থাকে। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত সামুদ্রিক প্রাণী তত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক মি. মিচেল ও সানক্রিস্টোভালের রেসিডেন্ট কমিশনার মি. গেরিফের সাহায্যে এর রহস্যভেদ হয়। দেখতে মানুষের মত প্রাণীগুলি আসলে “সাগর-দানবের বাহন মাত্র।”[৩৫] তার মধ্যে থেকে এক জাতীয় অদ্ভুত অক্টোপাস এই যন্ত্র অর্থাৎ তার বাহন চালিয়ে সমুদ্রের উপরে ডাঙায় ও সমুদ্রের তলদেশে নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারে। কিন্তু সামান্য অক্টোপাসরা যে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে তা মি. মিচেল বা মি. বাফেট কেউ ভাবেননি। তাই মি. মিচেল বিস্মিত হয়ে বলেন-

“এতদূর যে তারা যেতে পারে তা ভাবতে পারনি।”[৩৬]

গল্পের শেষটুকু পড়ে আমরা জানতে পারি এই সমস্ত প্রাণীদের সন্ধানে পৃথিবীর চারটি বড়ো দেশের উৎসাহে ও টাকায়- “অত্যন্ত শক্তিমান একটা সাবমেরিন তাই প্রশান্ত মহাসমুদ্রের জল ঘুলিয়ে ফিরছে।”[৩৭] যদিও তাদেরে সন্ধান এখনও মেলেনি।

গল্পটি অভিনবত্বের দাবী রাখে এবং গল্পটির সঙ্গে লেখক সত্যজিৎ-এর ‘প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্ত মৎস্য রহস্য’র মিল লক্ষ্য করা যায়।

বলাই বাহুল্য উপরোক্ত গল্পগুলিতে আমরা বিজ্ঞান চেতনার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি তুলে দেখানোর চেষ্টা করলাম প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক কাল্পনিক ভাবনাকে কেন্দ্র করে। সেই সাথে লেখক আমাদের বলতে চেয়েছেন যে, নির্বোধ প্রাণিগুলির প্রতি অত্যাচার বা অবিচার মানব সভ্যতার জন্য কতটা ভয়াবহ। লেখকের এই অভিনব চিন্তন সত্যিই প্রশংসনীয়। শব্দসংখ্যার সীমাবদ্ধতার জন্য আলোচ্য বিষয়কে অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত না করে এখানেই ইতি টানলাম।

Reference:

১. বিশ্বাস, সুখেন, কল্পবিজ্ঞানে প্রফেসর শঙ্কু, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৮
২. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, কিশোর সাহিত্য সম্ভার, শিশু সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৯
৩. রায়, সঙ্কর্ষণ (প্রাবন্ধিক), বিজ্ঞান ও সাহিত্য, বর্মন গুণধর (সম্পা), করমহাপাত্র সূর্যেন্দুবিকাশ (উপদেষ্টা), জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা, এপ্রিল-মে ১৯৮৫, ৩৮ তম বর্ষ, চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা, পৃ. ১৩৬-৩৮
৪. পূর্বোক্ত,
৫. মজুমদার, লীলা (প্রাবন্ধিক), বিজ্ঞান ও সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯-২১
৬. পূর্বোক্ত,
৭. দাশগুপ্ত, সাধন (প্রাবন্ধিক), বিজ্ঞান সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১-৩১
৮. দাস, তারকমোহন (প্রাবন্ধিক), বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের লক্ষ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২-৫৪
৯. ঘোষ, সিদ্ধার্থ (প্রাবন্ধিক), বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের সমস্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯-৬১
১০. বসু, জয়ন্ত (প্রাবন্ধিক), বিজ্ঞান সাহিত্য ও নবজাগরণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪-৩৬
১১. পূর্বোক্ত,
১২. চক্রবর্ত্তী, অমিত (প্রাবন্ধিক), ভালো বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য চাই বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকের মিলিত প্রয়াস, বাংলা পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২-৭৪
১৩. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র-১, দাশগুপ্ত সুরজিৎ (সম্পা), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০২, পৃ. ২১
১৪. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র-১, দাশগুপ্ত সুরজিৎ (সম্পা), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০২, পৃ. ২১
১৫. তদেব, পৃ. ৩০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 119 - 131
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৬. তদেব, পৃ. ৩৯
১৭. তদেব, পৃ. ৩৯
১৮. তদেব, পৃ. ৭৩
১৯. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, ঘনাদা সমগ্র-২, দাশগুপ্ত সুরজিৎ (সম্পা), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০২, পৃ. ২১
২০. তদেব, পৃ. ১১৩
২১. তদেব, পৃ. ১১৩
২২. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, কিশোর সাহিত্য সম্ভার, শিশু সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিলে ২০০৪, পৃ. ৫০
২৩. তদেব, পৃ. ৫০
২৪. তদেব, পৃ. ৭০
২৫. তদেব, পৃ. ৭০
২৬. দেব, অনীশ (সম্পা), সেরা কল্পবিজ্ঞান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ২৭
২৭. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, কিশোর সাহিত্য সম্ভার, শিশু সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিলে ২০০৪, পৃ. ১৯
২৮. তদেব, পৃ. ১৯
২৯. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, কিশোর সাহিত্য সম্ভার, শিশু সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিলে ২০০৪, সংকলন প্রসঙ্গে, চট্টোপাধ্যায় হীরেন।
৩০. তদেব, পৃ. ৭
৩১. তদেব, পৃ. ৫৭
৩২. তদেব
৩৩. তদেব, পৃ. ৩৭
৩৪. তদেব
৩৫. তদেব, পৃ. ৪৪
৩৬. তদেব, পৃ. ৪৪
৩৭. তদেব, পৃ. ৪৪

Bibliography:

কিশোর সাহিত্য সম্ভার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিশু সাহিত্য সংসদ।

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র, অনীশ দেব, পত্রভারতী।

বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।